কবিগুরু গ্যেটে

ফরাসি বিপ্লবের পরে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সাহিত্যে নব ভাবের নব উদ্যমের নব নব প্রত্যাশার সাড়া পড়ে যায়। সে যুগের সাহিত্যকে সাধারণত রোমান্টিক বলে বিশেষিত করা হয়। কিন্তু ভোর হবার আগে যেমন পাখি ডাকে তেমনি ফরাসি বিপ্লবের প্রাক্‌কাল হতেই কোনো কোনো দেশে রোমান্টিক সাহিত্যিকদের কলকূজন শুরু হয়ে যায়। জার্মানিতে এঁদের পরিচয় ঝড়ঝাপটা যুগের সাহিত্যিক বলে।

প্রথম যৌবনে 'তরুণ ভের্টেরের দুঃখ' লিখে গ্যেটে যখন দেশ বিদেশে রাতারাতি বিখ্যাত হন তখন জার্মানির ঝড়ঝাপটা যুগের বাণীমূর্তি বলেই তাঁর নাম করত সকলে। ইতিমধ্যে ও অতঃপর তিনি যেসব নাটক লেখেন তাতে তাঁর এ নাম পাকা হয়। কিন্তু সাফল্যের শিখরে উঠতে না উঠতেই তিনি স্বেচ্ছায় ও পথ থেকে সরে দাঁড়ালেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র ছাব্বিশ বছর। তাঁর কাছে তাঁর পক্ষপাতী পাঠক ও সমধর্মা লেখকদের আশার অন্ত ছিল না। আশায় নিরাশ হয়ে তাঁরা তাঁকে ভুল বুঝলেন ও দোষ দিলেন।

ঝড়ঝাপটা যুগের সাহিত্যিকদের যিনি নেতা তিনি কি তবে তাঁর যুগের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করলেন? আপাতদৃষ্টিতে এরকম মনে হওয়া বিচিত্র না। কারণ তিনি গেলেন ভাইমার নামক একটি সামন্ত রাজ্যের মন্ত্রী হয়ে। সেখানকার অভিজাত মহলে তাঁর অবারিত দ্বার। তাঁদের সঙ্গেই তাঁর লীলাখেলা দহরম মহরম। লেখা তাঁর হাত দিয়ে বেরোয় না বড়ো-একটা। বেরোয় যদি তো আগের মতো নয়। ক্বচিৎ এক-আধটা নিখুঁত কবিতা ঝরে পড়ে। ছাব্বিশ থেকে আটত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত এই তাঁর দশা।

বাইরে থেকে যা মনে হয় আসলে কিন্তু তা নয়। ঝড়ঝাপটা যুগের সাহিত্যও তো রোমান্টিক সাহিত্য। রোমান্টিক সাহিত্য বলতে যাই বোঝাক-না কেন ওর ভিতরে এমন কিছু ছিল যা পাঠকদের অশান্ত করে তুলত। লেখককেও। সেই অশান্তি যে কিসের জন্যে তা যখন বিশ্লেষণ করতে বসি তখন নেতি নেতি করতে করতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে কথার সঙ্গে কাজ চাই, নইলে কথা কেবল মুখের কথা। কাজ মানে বীরের মতো কাজ, বিদ্রোহ, বিপ্লব, সংঘাত, সংঘর্ষ। রোমান্টিক সাহিত্যের ভিতর অ্যাকশনের ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন। যার জীবনে অ্যাকশনের লেশমাত্র নেই সে রোমান্টিক সাহিত্যিক হয়ে দু'দিন বীরপূজা পাবে। তার পরে তার বিজয়া দশমী।

দশমীতে বিসর্জনের জন্যে অপেক্ষা না করে নবমীতে অপসরণ শ্রেয়। গ্যেটে সময় থাকতে সরে দাঁড়ালেন। তার পরে কী করবেন তা ভেবে মনঃস্থির করতে তাঁর দশ বারো বছর লাগল। একই মানুষ কবি হবে, বীর হবে, এমন দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে আছে কি না সন্দেহ। থাকলেও প্রথম শ্রেণীর নয়। রোমান্টিক কবিরা অধিকাংশ স্থলে নিবে যায়। যারা নিবতে চায় না তাদের বড়ো জ্বালার জীবন। তাদের বেলা দেখা যায়, হয় তারা কথার

সঙ্গে কাজের সঙ্গতি রাখতে গিয়ে কাজের লোক হয়ে উঠেছে, কাব্য ছেড়ে দিয়েছে, নয় তারা সুর বদলে দিয়েছে, রোমান্টিকের বদলে ক্লাসিক ধরেছে। ক্লাসিক সাহিত্যিকদের কাছে কেউ বিদ্রোহ বিগ্রহ আশা করে না। আশা করে প্রশান্ত উপভোগ বা রূপভোগ। যারা স্বভাবত ক্লাসিক তাদের কোনো দ্বন্দ্ব নেই। কিন্তু যে বেচারা রোমান্টিক পন্থ ছেড়ে ক্লাসিক পন্থ ধরবে তার পক্ষে এ যেন মৃত্যু ও নব জন্মগ্রহণ। মাঝখানে দশ বারো বছর গর্ভযন্ত্রণা।

বয়স যখন আটত্রিশ গ্যেটে পালিয়ে যান ইটালি। সেখানে বছর দেড়েক থেকে পুরোদস্তুর ক্লাসিক দীক্ষা নেন। তার পরে যখন দেশে ফিরে আসেন তখন তাঁর মুখে অন্য সুর। তখন তিনি বাণীমূর্তি আর-এক যুগের। এ যুগ নয়া ক্লাসিক যুগ। কিন্তু পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে এর স্বতোবিরোধ ছিল। ঠিক সেই সময় শুরু হয় ফরাসি বিপ্লব। লোকে তখন ক্লাসিক চায় না। যার চাহিদা নেই তা লিখছেই বা ক'জন! একা গ্যেটে এক হাতে কতটুকু করবেন! 'এগমণ্ট', 'তাসো' প্রভৃতি কয়েকটি পরীক্ষার পর তিনি বিজ্ঞানে মন দিলেন ও বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভ লিখে অন্য এক রাজ্যে জয়যাত্রা করলেন।

পরে শিলার তাঁর পরীক্ষার সাথী হন। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন দুজনেই। গ্যেটের 'হেরমান ও ডরোথেয়া', শিলারের 'ভিলহেলম টেল' দুজনের দুই ক্লাসিক কীর্তি। কিন্তু ইউরোপের নানা দেশে তখন ফরাসি বিপ্লবের বান ডাকছে। বাইরের জগতে যখন ঝড়ঝাপটা চলছে মানসিক জগতে তখন শরতের প্রশান্তি কেমন করে স্থায়ী হবে! গ্যেটে ক্লাসিকের দীক্ষা নিয়েও রোমান্টিকের আবর্ত থেকে উদ্ধার পেলেন না। শিলারের মৃত্যুর পর একাকী বোধ করলেন। একক চেষ্টায় শেষ করলেন 'ফাউস্ট' প্রথম ভাগ। ভাবলেন ক্লাসিক সাধনার পরাকাষ্ঠা হলো। কিন্তু হলো রোমান্টিক সাধনার বিলম্বিত ও বিমিশ্র পরাকাষ্ঠা।

ইতিপূর্বেই তাঁর 'ভিলহেলম মাইস্টারের শিক্ষানবিশি' শেষ হয়েছিল। এ ক্ষেত্রেও ক্লাসিক ও রোমান্টিকের বিচিত্র মিশ্রণ। প্রধানত এই দুখানি মহাগ্রন্থের উপর তাঁর দেশকালোত্তর যশ নির্ভর করছে। এছাড়া তাঁর বিভিন্ন বয়সের অগ্নিগর্ভ প্রণয়কবিতার উপর। প্রেমের দহন তাঁকে সারা জীবন দগ্ধেছে। ঈশ্বর তাঁকে এমন করে সৃষ্টি করেছিলেন যে প্রেমের অনুভূতি তাঁকে বার-বার আগুনে পুড়িয়ে সোনার মানুষ করেছিল। সোনা হয়ে তিনি যাই লিখলেন তাই সোনা হয়ে গেল। নারী তাঁকে কোনোদিনই বিপথে নেয়নি। প্রতিবারেই নিয়ে গেছে ঊর্ধ্ব হতে আরো ঊর্ধ্বে। বিরাশি বছর বয়সে মৃত্যুর অল্প দিন পূর্বে যখন 'ফাউস্ট' দ্বিতীয় ভাগ সমাপ্ত হয় তখন তাঁর শেষ কথা হলো—

'The Eternal-Womanly draws us above.'

নারী সম্পর্কে দান্তের পরে এত বড়ো প্রশস্তি আর কেউ রচনা করেননি।

যুগের সঙ্গে যোগাযোগ সেই ছাব্বিশ বছর বয়সের পর থেকে বেতালা হয়েছিল বলে গ্যেটের কপালে ছিল নিরবচ্ছিন্ন ভুল বোঝা। ঊর্ধ্বচারী বলে শ্রদ্ধা করত তাঁকে সকলে, এমন কি শত্রুরাও। কিন্তু ঠিক বুঝত না বেশি লোক। এখনো তাঁর প্রতি একটা বিমুখভাব রয়ে গেছে তাঁর দেশে ও বিদেশে। ঝড়-ঝাপটার যুগ এখনো জগৎ জুড়ে চলছে। রোমান্টিক সাহিত্যই সাধারণের হৃদয় হরণ করে। কিন্তু যারা লেখে তারা বীর নয়, তাই নিজেরাও তৃপ্তি পায় না, অপরকেও দিতে পারে না। যেভাবে গ্যেটে তাঁর সমস্যার সমাধান করেছিলেন সেভাবে অর্থাৎ ক্লাসিক দীক্ষা নিয়ে সমাধান করতে পারছে ক'জন! সমাধানের জন্যে যাচ্ছে নিচে নেমে। করছে মনোরঞ্জন। সাহিত্য হয়ে উঠছে সিনেমার মতো এনটারটেনমেন্ট। আর যারা ওভাবে সমাধান করতে

অনিচ্ছুক তারা অন্য কোনো উপায় খুঁজে না পেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ছে, তাদের মানসিক অস্বাস্থ্য তাদের দেহকে আক্রমণ করছে। এমনি করেই তো মারা গেলেন শেলি কিটস্ বায়রন। কেউ জলে ডুবে, কেউ যক্ষ্মায়, কেউ যুদ্ধের নাম করে। যারা মরে না তারা পাগল হয়ে যায়।

এ সব কথা যদি মনে রাখি তা হলে বুঝতে পারি গ্যেটে কেন 'কবিগুরু'। কাজী আবদুল ওদুদ কেন তাঁর গ্রন্থের নাম রেখেছেন 'কবিগুরু গ্যেটে'। ইচ্ছা করলে তিনি বলতে পারতেন 'মহাকবি গ্যেটে'। কিন্তু আজকের দিনের কবিদের কাছে মহাকবির চেয়ে কবিগুরুর তাৎপর্য বেশি। একালের কবিরা যদি বুঝতে চেষ্টা করেন তাঁকে তা হলে তাঁর আর কতটুকু লাভ হবে! লাভ হবে একালের কবিদের অনেক কিছু। তা বলে তাঁর অনুসরণ করা চলবে না। সম্ভব নয়ও। যুগের সঙ্গে তাল রাখার কাজে ব্যর্থ হয়েছিলেন তিনি। তাঁর ব্যর্থতা যেন কেউ নিজের ব্যর্থতার সমর্থন রূপে ব্যবহার না করেন।

কাজী সাহেবের এই গ্রন্থ কেবল বাংলা সাহিত্যে নয়, বোধহয় ভারতীয় সাহিত্যেও অপূর্ব। ইংরেজিতেও এমন জীবনীর সঙ্গে অনুবাদের সংযোজন বড়ো-একটা চোখে পড়ে না। গ্যেটের অনেকগুলি কবিতার তর্জমা আমি এই প্রথম পড়লুম, কেননা ইংরেজি তর্জমা কিনতে পাওয়া যায় না অনায়াসে। কাজী সাহেব স্বয়ং একজন প্রচ্ছন্ন কবি। সেইজন্যে তাঁর তর্জমা হয়েছে মৌলিকের মতো মধুর। তার উপর তিনি আজীবন গ্যেটেপন্থী। গ্যেটে তাঁর কাছে কেবল কবি নন, জীবনপথের দিশারী। গ্যেটের বহু অমূল্য বাণী তিনি একত্র গ্রথিত করেছেন। এটিও এ গ্রন্থের অন্যতম আকর্ষণ। যাঁরা যেমন তেমন করে বাঁচতে চান না, কেমন করে বাঁচব এ যাঁদের প্রশ্ন, সেইসব জীবনজিজ্ঞাসুকে পড়তে হবে এ বই। নয়তো খুঁজতে হবে 'একারমানের সঙ্গে গ্যেটের কথোপকথন' নামক ইংরেজি বই।

কাজী সাহেব গ্যেটেগৃহিণী ক্রিস্টিয়ানাকে যথেষ্ট জায়গা দেননি বলে তাঁর সঙ্গে আমার ঝগড়া আছে। গৃহিণীকে পত্নীর মর্যাদা দিতে পনেরো বছর ধরে ইতস্তত করা কি উচিত হয়েছিল গ্যেটের, এ কথা এই দেড় শ বছর অনেকের মনে উদয় হয়েছে। এর একটা নিষ্পত্তি চাই। নইলে লোকে চিরকাল তাঁকে ভুল বুঝবে। জীবনশিল্পীদের জীবনের বড়ো বড়ো সিদ্ধান্তগুলো অকারণ নয়। কারণ আছে নিশ্চয়ই, যদিও আপাতদৃষ্টিতে স্পষ্ট নয়। প্রথম যৌবনে কবি যাঁকে ভালোবাসতেন তাঁর নাম ফ্রিডেরিকা। এঁর ভালোবাসাও তিনি পেয়েছিলেন। বিবাহের বয়স হয়েছিল, এমন কোনো বাধাবিঘ্ন ছিল না, সমান ঘর না হলেও যাজকের সম্মান সব দেশে। কেন তবে তিনি ব্যথা বুকে চেপে বিদায় নিলেন? কারণ খ্রিস্টীয় বিবাহে পাত্র-পাত্রীকে অঙ্গীকার করতে হয়, সারা জীবন বিশ্বস্ত থাকব। গ্যেটের পক্ষে এরূপ অঙ্গীকার প্রকৃতিবিরুদ্ধ হতো। হয়তো তিনি বিশ্বস্ত থাকতেন জীবনের অবশিষ্ট ষাট বছর। কিন্তু যদি না পারতেন তা হলে কী হতো? তা হলে হতো অসত্যাচরণ। অথবা আপনার প্রতি অবিচার। চোখ বুজে অত বড়ো একটা অঙ্গীকার করা উচিত হতো না। সেই জন্যে তিনি বিবাহের প্রস্তাব না করে প্রস্থান করলেন। কয়েক বছর পরে লিলির সঙ্গে তাঁর বিয়ের কথাবার্তা পাকা হয়ে গেল। এমন সময় তিনি চললেন সুইটজারল্যাণ্ড ও তার পরে ভাইমার। বাগ্‌দানের পরে লিলির পিতা-মাতার মত ছিল না বলে বাগ্‌দান ভঙ্গ করতেন কেন গ্যেটে? তা নয়। খ্রিস্টীয় বিবাহের ভিত্তিভূমি যে আজীবন বিশ্বস্ত

থাকার অঙ্গীকার সেই অঙ্গীকারের দ্বারা তিনি নিজেকে বাঁধতে পারলেন না। এমন যে গ্যেটে তিনি ক্রিস্টিয়ানাকে খ্রিস্টীয় মতে বিবাহ করতেন কেমন করে? সিভিল ম্যারেজ তখনকার দিনে চলিত ছিল না। সম্পর্ক না পাতালেই পারতেন, কিন্তু ক্রিস্টিয়ানার দিক থেকে বিবাহের প্রত্যাশা ছিল না। তিনি জানতেন যে অভিজাতের সঙ্গে শ্রমিকের বিবাহ সেকালের সমাজ সহ্য করত না। যা হবার নয় তার চেয়ে যা হয়ে থাকে তাই ভালো। এই ভাবেই তাঁদের মিলন হয়। পরবর্তীকালে পুত্রের ভবিষ্যৎ ভেবে গ্যেটে নিজের থেকেই ক্রিস্টিয়ানার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বিধিবদ্ধ করে নেন। এবং রাজদরবারকে দিয়ে স্বীকার করিয়ে নেন যে তাঁর পুত্র আইনসঙ্গত বংশধর। এর পরে তাঁর ছেলের বড়ো ঘরে বিয়ে হয়। অভিজাত সমাজ তাকে মেনে নেয়। প্রথম থেকেই গ্যেটে ক্রিস্টিয়ানার প্রতি সশ্রদ্ধ ছিলেন। বিশ্বস্ত থাকতে তাঁর কিছুমাত্র কষ্ট হয়নি। ক্রিস্টিয়ানাও ছিলেন অসাধারণ পতিগতপ্রাণা। সুতরাং তাঁদের সম্পর্ক বিধাতার চোখে বিবাহই ছিল, মানুষের চোখে যাই হোক না কেন। আর একটি কথা, গ্যেটে কোনো দিনই কোনো মানুষকে হীন জ্ঞান করেননি। কোনো শ্রেণীকেই তিনি নীচ শ্রেণী বলে ভাবতেন না। অভিজাত বলে তাঁর গর্ব ছিল না। তবে এ বিষয়ে তিনি সচেতন ছিলেন তা ঠিক। কাজী সাহেবের গ্রন্থ থেকে একটি উদ্ধৃতি দিয়ে শেষ করি।

> 'নিম্ন শ্রেণীর লোকদের সঙ্গে গ্যেটে চিরদিন মিশতেন, দয়াপরবশ হয়ে নয়, শ্রদ্ধার সঙ্গে। তাদের তিনি ভাবতেন, "ভগবানের সৃষ্টিতে যেন সর্বশ্রেষ্ঠ—সংযম, সন্তোষ, ঋজুতা, বিশ্বাস, সামান্য সৌভাগ্যে উৎফুল্লতা, সরলতা, অনন্ত-কষ্টসহিষ্ণুতা, এই সমস্ত গুণ তাদের মধ্যে বর্তমান।" গ্যেটের পুত্রবধূ লুইসের কাছে বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন এই বলে যে অত বড়ো জ্ঞানী সামান্য লোকদের সঙ্গে যে কী করে প্রাণভরে আলাপ করতেন তা তাঁর ধারণার অতীত।' (১৫৭ পৃষ্ঠা)

গ্যেটের এই নিম্নশ্রেণীপ্রীতির সূচনা হয় বাল্যকালেই। তখন ভালোবাসতেন সত্যিকারের এক গ্রেট্‌খেনকে। সেই গ্রেট্‌খেনই বিবর্তিত হতে হতে হয়ে উঠল 'ফাউস্টে'র মার্গারেট বা গ্রেচেন। নিম্নশ্রেণীর এই বালিকাই জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটকের মহীয়সী নায়িকা রূপে কবির পরিণত বয়সের অন্তিম প্রশস্তির অধিকারিণী হয়েছে চিরস্মরণীয় আর্য বাক্যে—

'The Eternal-Womanly draws us above.'

(১৯৪৯)

ফ্রিডেরিকা ক্রিস্টিয়ানা
লিলি